

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি:

১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। সংসারে বারবার অর্থকষ্ট ঘটায় মতিলাল চট্টোপাধ্যায় কন্যা-পুত্র ও স্ত্রীকে নিয়ে ভাগলপুরে শ্বশুরগোষ্ঠীর আশ্রয় নেন। সেখানে গিয়ে শরৎচন্দ্র তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯৪ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করে এফ.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৯৬ সালে অর্থাভাবে পড়াশোনায় ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার হাতেখড়ি হয় ভাগলপুরে।

এরপর কর্মসূত্রে বর্মাতে গিয়েও সাহিত্য সাধনা চালিয়ে যেতে থাকেন। 'বড়দিদি' গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বর্মাতে থাকার সময় তিনি ইংরেজি উপন্যাস থেকে সারবস্তু গ্রহণ করে নিজেই উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সে সব উপন্যাসের মধ্যে দত্তা, দেনাপাওনা প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি অনিলা দেবী ছদ্মনামেও লিখতেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল-বড়দিদি, বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশাই, শ্রীকান্ত, নিষ্কৃতি, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ প্রভৃতি। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি এই কথাশিল্পীর মৃত্যু হয়।

লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল তার নাম লালু। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে-অর্থাৎ, সে এতকাল পূর্বে যে, তোমরা ঠিকমতো ধারণা করতে পারবে না-আমরা একটি ছোট বাঙলা ইস্কুলের এক ক্লাসে পড়তাম। আমাদের বয়স তখন দশ-এগারো। মানুষকে ভয় দেখাবার, জব্দ করবার কত কৌশলই যে তার মাথায় ছিল তার ঠিকানা নেই। ওর মাকে রবারের সাপ দেখিয়ে একবার এমন বিপদে ফেলেছিল যে, তিনি পা মচক্কে প্রায় সাত-আটদিন খুঁড়িয়ে চলতেন। তিনি রাগ করে বললেন-ওর একজন মাস্টার ঠিক করে দিতে। সন্ধ্যাবেলায় এসে পড়াতে বসবেন, ও আর উপদ্রব করবার সময় পাবে না।

শুনে লালুর বাবা বললেন, না। তাঁর নিজের কখনো মাস্টার ছিল না, নিজের চেষ্টায় অনেক দুঃখ সয়ে লেখাপড়া করে এখন তিনি একজন বড় উকিল। ইচ্ছে ছিল, ছেলেও যেন তেমনি করেই বিদ্যা লাভ করে। কিন্তু শর্ত হল এই যে, যে-বার লালু ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম না হতে পারবে তখন থেকে থাকবে ওর বাড়িতে পড়ানোর টিউটার। সে যাত্রা লালু পরিত্রাণ পেলে, কিন্তু মনে মনে রইল ও মা'র 'পরে চটে। কারণ, উনি তার ঘাড়ে মাস্টার চাপানোর চেষ্টায় ছিলেন। সে জানত বাড়িতে মাস্টার ডেকে আনা আর পুলিশ ডেকে আনা সমান।

লালুর বাপ ধনী গৃহস্থ। বছর কয়েক হল পুরানো বাড়ি ভেঙে তেতলা বাড়ি করেছেন; সেই অবধি লালুর মায়ের আশা গুরুদেবকে এ-বাড়িতে এনে তাঁর পায়ের ধুলো নেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, ফরিদপুর থেকে এতদূরে আসতে রাজি হন না, কিন্তু এইবার সেই সুযোগ ঘটেছে। স্মৃতিরত্ন সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশী এসেছেন, সেখান থেকে লিখে পার্টিয়েছেন-ফেরবার পথে নন্দরানীকে আশীর্বাদ করে যাবেন। লালুর মা'র আনন্দ ধরে না-উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত-এতদিনে মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, গুরুদেবের পায়ের ধুলো

পড়বে. বাড়িটা পবিত্র হয়ে যাবে.

নীচের বড় ঘরটা থেকে আসবাবপত্র সরানো হলো, নতুন ফিতের খাট, নতুন শয্যা তৈরি হয়ে এলো,-গুরুদেব শোবেন. এই ঘরেরই এক কোণে তাঁর পুজো-আহ্নিকের জায়গা হল, কারণ তেতলার ঠাকুরঘরে উঠতে নামতে তাঁর কষ্ট হবে. দিন-কয়েক পরে গুরুদেব এসে উপস্থিত হলেন. কিন্তু কি দুর্যোগ! আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের ঘটা, যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি-তার আর বিরাম নেই. এদিকে মিষ্টান্নাদি তৈরি করতে, ফল-ফুল সাজাতে লালুর মা নিশ্বাস নেবার সময় পান না. তারই মধ্যে স্বহস্তে ঝেড়েঝুড়ে মশারি গুঁজে দিয়ে বিছানা করে গেলেন. নানা কথাবার্তায় রাত হয়ে গেল, পথশ্রমে ক্লান্ত গুরুদেব আহালাদি সেরে শয্যা গ্রহণ করলেন. চাকর-বাকর ছুটি পেলে. সুকোমল শয্যার পারিপাটে প্রসন্ন গুরুদেব মনে মনে নন্দরানীকে আশীর্বাদ করলেন.

কিন্তু গভীর রাতে অকস্মাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল. ছাদ চুঁইয়ে মশারি ফুঁড়ে তাঁর সুপরিপুষ্ট পেটের উপর জল পড়চে. উঃ, কি ঠান্ডা সে জল! শশব্যস্তে বিছানার বাইরে এসে পেটটা মুছে ফেললেন, বললেন, নতুন বাড়ি করলে নন্দরানী, কিন্তু পশ্চিমের কড়া রোদে ছাতটা এর মধ্যেই ফেটেচে দেখছি. ফিতের খাট ভারী নয়, মশারি-সুদ্র সেটা ঘরের আর একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন. কিন্তু আধ মিনিটের বেশি নয়, চোখ দুটি সবে বুজেছেন, অমনি দু চার ফোঁটা তেমনি ঠান্ডা জল টপটপ টপটপ করে পেটের ঠিক সেই স্থানটির উপরেই ঝরে পড়ল.

স্মৃতিরত্ন আবার উঠলেন, আবার খাট টেনে অন্যধারে নিয়ে গেলেন, বললেন, ইঃ ছাতটা দেখছি এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত ফেটে গেছে. আবার শুলেন, আবার পেটের উপর জল ঝরে পড়ল. আবার উঠে পেটের জল মুছে খাটটা টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু শোবামাত্রই তেমনি জলের ফোঁটা. আবার টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু সেখানেও তেমনি. এবার দেখলেন বিছানাটাও ভিজেছে, শোবার জো নেই. স্মৃতিরত্ন বিপদে পড়লেন. বুড়ো-মানুষ; অজানা জায়গায় দোর খুলে বাইরে যেতেও ভয় করে, আবার থাকাও বিপজ্জনক. কি জানি ফাটা ছাত ভেঙে হঠাৎ মাথায় যদি পড়ে! ভয়ে ভয়ে দোর খুলে বারান্দায় এলেন, সেখানে লণ্ঠন একটা জ্বলছে বটে, কিন্তু কেউ কোথাও নেই,-ঘোর অন্ধকার.

সেখানে অগুন যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়ো হাওয়া! দাঁড়বার জো কি! কোথায় চাকর-বাকর, কোন ঘরে শোয় তারা-কিছুই জানেন না তিনি. চেষ্টা করে ডাকলেন, কিন্তু কারো সাড়া মিলল না. একধারে একটা বেঞ্চি ছিল, লালুর বাবার গরিব মক্কেল যারা, তারাই এসে বসে. গুরুদেব অগত্যা তাতেই বসলেন. আত্মমর্যাদার যথেষ্ট লাঘব হল; অন্তরে অনুভব করলেন, কিন্তু উপায় কি! উত্তরে বাতাসে বৃষ্টির ছাটের আমেজ রয়েছে-শীতে গা শিরশির করে-কোঁচার খুটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, পা দুটি যথাসম্ভব উপরে তুলে, যথাসম্ভব আরাম পাবার আয়োজন করে নিলেন. নানাবিধ শ্রান্তি ও দুর্বিপাকে দেহ অবশ, মন তিক্ত, ঘুমে চোখের পাতা ভারাতুর, অনভ্যস্ত গুরু-ভোজন ও রাত্রি-জাগরণে দু-একটা অল্প উদ্‌গারের আভাস দিলে-উদ্বেগের অবধি রইল না!

হঠাৎ এমনি সময় অভাবনীয় নতুন উপদ্রব. পশ্চিমের বড় বড় মশা দুই কানের পাশে এসে গান জুড়ে দিলে. চোখের পাতা প্রথমে সাড়া দিতে চায় না, কিন্তু মন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল-কি জানি এরা সংখ্যায় কত. মাত্র মিনিট দুই-অনিশ্চিত নিশ্চিত হল; গুরুদেব বুঝলেন সংখ্যায় এরা অগণিত. সে বাহিনীকে উপেক্ষা করে বিশ্বে এমন বীরপুরুষ কেউ নেই. যেমন তার জ্বলুনি তেমনি তার চুলকুনি.

স্মৃতিরত্ন দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন, কিন্তু তারা সঙ্গ নিলে। ঘরের মধ্যে জলের জন্য যেমন, ঘরের বাইরে মশার জন্য তেমন। হাত-পায়ের নিরন্তর আক্ষেপে, গামছার সঘন সঞ্চালনে কিছুতেই তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় না। স্মৃতিরত্ন এপাশ থেকে ওপাশে ছুটে বেড়াতে লাগলেন, শীতের মধ্যেও তাঁর গায়ে ঘাম দিলে। ইচ্ছে হল ডাক ছেড়ে চৈতান, কিন্তু নিতান্ত বালকোচিত হবে ভেবে বিরত রইলেন। কল্পনায় দেখলেন নন্দরানী সুকোমল শয্যায় মশারির মধ্যে আরামে নিদ্রিত, বাড়ির যে যেখানে আছে পরম নিশ্চিন্তে সুপ্ত-শুধু তাঁর ছুটোছুটিরই বিরাম নেই। কোথাকার ঘড়িতে চারটে বাজল, বললেন, কামড়া ব্যাটারা যত পারিস, কামড়া, -আমি আর পারিনে। বলেই বারান্দার একটা কোণে পিঠের দিকটা যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, সকাল পর্যন্ত যদি প্রাণটা থাকে তো এ দুর্ভাগা দেশে আর না। যে গাড়ি প্রথমে পাব সেই গাড়িতে দেশে পালাব। কেন যে এখানে আসতে মন চাইত না তার হেতু বোঝা গেল। দেখতে দেখতে সর্বসম্প্রাপহর নিদ্রায় তাঁর সারারাত্রির সকল দুঃখ মুছে দিলে, -স্মৃতিরত্ন অচেতনপ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে নন্দরানী ভোর না হতেই উঠেছেন, -গুরুদেবের পরিচর্যায় লাগতে হবে। রাত্রে গুরুদেব জলযোগ মাত্র করেছেন-যদিচ তা গুরুতর-তবু মনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল, খাওয়া তেমন ভালো হয় নাই। আজ দিনের বেলা নানা উপচারে তা ভরিয়ে তুলতে হবে।

নীচে নেমে এলেন, দেখেন দোর খোলা। গুরুদেব তাঁর আগে উঠেছেন ভেবে একটু লজ্জা বোধ হল। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখেন তিনি নেই, কিন্তু এ কি ব্যাপার! দক্ষিণ দিকের খাট উত্তর দিকে, তাঁর ক্যান্ডিসের ব্যাগটা জানালা ছেড়ে মাঝখানে নেমেচে, কোষাকুশি, আসন প্রভৃতি পূজাহিকের জিনিসপত্রগুলো সব এলোমেলো স্থানভ্রষ্ট, কারণ কিছুই বুঝলেন না। বাইরে এসে চাকরদের ডাকলেন, তারা কেউ তখনো ওঠেনি। তবে একলা গুরুদেব গেলেন কোথায়? হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল-ওটা কি? এক কোণে আলো-অন্ধকারে মানুষের মতো কি একটা বসে না! সাহসে ভর করে একটু কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখেন তাঁর গুরুদেব। অব্যক্ত আশঙ্কায় চৈতিয়ে উঠলেন, ঠাকুরমশাই! ঠাকুরমশাই!

ঘুম ভেঙে স্মৃতিরত্ন চোখ মেলে চাইলেন, তার পরে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন। নন্দরানী ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায় কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরমশাই, আপনি এখানে কেন?

স্মৃতিরত্ন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সারা রাত দুঃখের আর পার ছিল না যে মা!

কেন বাবা?

নতুন বাড়ি করেচ বটে মা, কিন্তু ছাত কোথাও আর আস্ত নেই। সারা রাতের বৃষ্টি-বাদল বাইরে তো পড়েনি, পড়েচে আমার গায়ের উপর। খাট টেনে যেখানে নিয়ে যাই সেখানেই পড়ে জল। পাছে ছাত ভেঙে মাথায় পড়ে, পালিয়ে এলাম বাইরে, কিন্তু তাতেই কি রক্ষা আছে মা, পঙ্গপালের মতো ডাঁশ-মশা ঝাঁকে ঝাঁকে সমস্ত রাত্রি যেন ছুবলে খেয়েছে, -এধার থেকে ছুটে ওধার যাই, আবার ওধার থেকে ছুটে এধারে আসি। গায়ের অর্ধেক রক্ত বোধ করি আর নেই মা।

বহু প্রয়াস, বহু সাধ্য-সাধনায় ঘরে আনা বৃদ্ধ গুরুদেবের অবস্থা দেখে নন্দরানীর দুচোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠল, বললেন, কিন্তু বাবা, বাড়িটা যে তেতলা, আপনার ঘরের উপর আরও যে দুটো ঘর আছে, বৃষ্টির জল তিন-তিনটে ছাদ ফুঁড়ে নামবে কি করে? কিন্তু বলতে বলতেই তাঁর সহসা মনে হলো এ হয়তো ওই শয়তান লালুর কোনোরকম শয়তানি বুদ্ধি। ছুটে গিয়ে বিছানা হাতড়ে দেখেন মাঝখানে

চাদর অনেকখানি ভিজে এবং মশারি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে. তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে দেখতে পেলেন ন্যাকড়ায় বাঁধা এক চাঙড় বরফ, সবটা গেলেনি, তখনও এক টুকরো বাকি আছে. পাগলের মতো ছুটে বাহিরে গিয়ে চাকরদের যাকে সুমুখে পেলেন চৈঁচিয়ে হুকুম দিলেন,-হারামজাদা লেলো কোথায়? কাজকর্ম চুলোয় যাক গে, বজ্জাতটাকে যেখানে পাবি মারতে মারতে ধরে আন.

লালুর বাবা সেইমাত্র নীচে নামছিলেন, স্ত্রীর কাণ্ড দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, কী কাণ্ড করচ? হল কি? নন্দরানী কেঁদে ফেলে বললেন, হয় তোমার ওই লেলোকে বাড়ি থেকে তাড়াও, না হয় আজই আমি গঙ্গায় ডুবে এ-মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করব.

কী করলে সে?

বিনা দোষে গুরুদেবের দশা কি করেছে চোখে দেখে এসো. তখন সবাই গেলেন ঘরে. নন্দরানী সব বললেন, সব দেখালেন. স্বামীকে বললেন, এ দস্যি ছেলেকে নিয়ে ঘর করব কি করে তুমি বলো?

গুরুদেব ব্যাপারটা সমস্ত বুঝলেন. নিজের নির্বুদ্ধিতায় বৃদ্ধ হাঃ হাঃ করে হেসে ফেললেন.

লালুর বাবা আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন. চাকররা এসে বললে, লালুবাবু কোঠি মে নহি হয়. আর একজন এসে জানালে সে মাসিমার বাড়িতে বসে খাবার খাচ্ছে. মাসিমা তাকে আসতে দিলেন না.

মাসিমা মানে নন্দর ছোট বোন. তার স্বামীও উকিল, সে অন্য পাড়ায় থাকে. এর পরে লালু দিন-পনেরো আর এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দিলে না.